দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশভাগের রাজনীতি ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

যে সম্পত্তি বা সম্পদ যা কিছু হোক না কেন, পিছনে একটি ইতিহাস তো থাকবেই। সরলভাবে চলতে থাকলে ভাগ হওয়ার প্রশ্ন আসে না। সরল পথের সবকিছুই উত্তম। তারপরও কেন এতো মতভেদ এতো বৈষম্য। এসবের উত্তরও জানা। তবুও বিদ্বেষ লেগেই আছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আমাদের সামনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক ঘটিয়েছে। তর্ক বিতর্ক সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। তবে ইতিহাস সঠিক মূল্যায়নে সহায়তা করে। দালিলিক প্রমাণ স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যা-ই হোক বাস্তবতার সম্মুখীন থেকে এড়িয়ে চলা দুষ্কর। দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী ছিল বলেই হয়েছে। পক্ষ-বিপক্ষ মত আছে। একবিংশ শতাব্দীতে দেশভাগ নিয়ে আলোচনা- পর্যালোচনা আনন্দিত বা মর্মাহত হতে পারি কিন্তু যে বিভাজনের ফলে একটি অংশের অখন্ডতা থেকে আরেকটি হলে তা ইতিহাসের নিরীখে প্রশান্তি অনেকটা লঘু হওয়াই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের উপলক্ষ্য ছিল কারণ এখানে আনুগত্য বিস্তারের সহজ সুযোগ বিদ্যমান ছিল। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে আসার পূর্বে লন্ডনে লেডি মেরি কার্জন গৃহপরিচারিকার অভাব বোধ করছিলেন। সেখানে ভারতবর্ষে এসে সাতশতাধিক গৃহপরিচারিকার সেবা গ্রহণ, প্রাপ্যতা এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট তুলে ধরে। বিভিন্ন দিক থেকে সহজলভ্যতা শোষণের হাতিয়ার অর্পন করা যেমন গত্যন্তর ছিল না তেমনি একটি অংশের সুবিধা প্রাপ্তির মাত্রা তীব্রতর হতে থাকে। ভারতবর্ষে প্রদেশগুলোতে নিজস্ব স্বার্থের দিক বিবেচনা করে শাসক নির্বাচন করা হতো। মুসলমান, শিখ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে আসনসংখ্যা বন্টন করা হতো। বাঙলায় প্রস্তাবিত আইনসভার ২৫০টি আসনের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে মোট আসনের দশ ভাগ দেয়া হয়েছিল (২৫০টি আসনের ২৫টি)।[১]

বাঙলায় সম্পদায়গত রোয়েদাদ[২]

নির্বাচনী এলাকা	আসন সংখ্যা
মুসলমান	১১৭
মুসলিম মহিলা	২
সাধারণ	৭০
অনুন্নত শ্রেণী	১০
সাধারণ মহিলা	২
ইউরোপীয়	১১
ইউরোপীয় ব্যবসায়ী	১৪
ভারতীয় ব্যবসায়ী	৫
জমিদার	৫

বিশ্ববিদ্যালয়	২
শ্রমিক	৮
এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান	৩
এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান মহিলা	১

বেঙ্গল কাউন্সিলে মুসলিমরা আসন পায় ৩৯টি আর হিন্দুরা আসন পায় ৪৬টি। যেখানে মুসলিমরা ছিল শতকরা ৫৪ ভাগ [২৭.৮ মিলিয়ন] আদমসুমারি ১৯৩১ অনুসারে। সঙ্গত কারণে হিন্দুরা আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। যদিও আইনসভায় মুসলিমরা মজবুত অবস্থায় থাকে।[৩] ভদ্রলোকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক জগতের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ঐ স্মারকে স্বাক্ষর করেন; এদের মধ্যে ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রসায়নবিদ ড. পি.সি. রায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। 'হিন্দু নেতৃবৃন্দের ঘোষণাপত্র' নামে অন্য এক স্মারকলিপিতে ঘোষণা করা হয়।[৪]

সংখ্যার দিক দিয়ে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ট হলেও সামাজিক সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে তারা এগিয়ে ছিল। উপনিবেশিক শাসক থেকে শুরু করে আর্থসামাজিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট হিন্দুদের এগিয়ে নেয়। এছাড়া ভারতবর্ষের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিমদের প্রতি তুলনামূলকভাবে কম সহায়ক ছিল। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও রাজনৈতিক উপযুক্ততায় হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে তাদের অবদান এবং রাজ্যের প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় তাদের সেবার খতিয়ান এত সুবিদিত যে, তা পুনরুক্তি করার প্রয়োজন নেই। শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে হিন্দু বাঙালিদের সাফল্য সবার চেয়ে বেশি; অথচ বাঙলায় মুসলমান সম্প্রদায় এমন কোনো ব্যক্তিকে সৃষ্টি করতে পারেনি যে ঐসব ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।[৫]

কংগ্রেস একটা হিন্দু সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়। এর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটা হল মুসলমানদের ধ্বংস করার হিন্দু মনোবৃত্তির অন্য এক অভিব্যক্তি। সারা ভারতে হিন্দু কংগ্রেসবাদী, স্বরাজবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদীরা (রিভাইভ্যালিস্ট) ভারত থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করেছে তা চরম বিপজ্জনক। সুতরাং মুসলমানেরা যদি তাদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায্য লড়াই না করে কেউ তাদের রক্ষা করতে সমর্থ হবে না।[৬]

ফলে অধিকাংশ মুসলিম কংগ্রেস ত্যাগ করে বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকে। নেতৃত্বহীন অবস্থায় মুসলিমরা তাদের পুরোনো সংগঠন খেলাফত কমিটিতে আশ্রয় নিতে চায় কিন্তু জোট বাধতে ব্যর্থ হয়। মুসলিমদের এমন অবস্থায় এ কে ফজলুল হক সরাসরি তাদের পক্ষাবলম্বন করলে মুসলমানরা দ্বিমত হওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতাই একমাত্র হেতু না হয়ে সক্রিয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে মতের ভিন্নতা প্রকট আকার ধারন করেছিল। অনেকে জোট ছেড়ে পৃথকভাবে রাজনীতি করার যে মানসিকতা ছিল না তা প্রকট আকার ধারন করেছিল। মুসলিমদের মধ্যে মতের ভিন্নতা এমনিতেই ছিল তদুপরি চিড় ধরাবার জন্য যত উপাদান গ্রহণ করতে হয় তা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে পৃথক হলে যে বৃহত্তর স্বার্থ উদ্ধার কা দূরহ হয় তা ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও এ চক্র

থেকে বের হতে পারেনি মুসলিম নেতৃবৃন্দ। যেমনটি ঘটেছিল ১৭৫৭ সালে পলাশীতে। নবাব সিরাজদৌলার প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খান নবাবের খালাম্মা ঘসেটি বেগমের সহযোগিতায় চরম বিদ্রোহ করে দুইশত বছরের গোলামীর জিঞ্জির নিতে ও কার্পণ্য করেনি মুসলিম নেতৃত্ব।

১৯৩১ সালে বেঙ্গল সরকার হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য গোষ্ঠীকে 'তফশিলি সম্প্রদায়' এর স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী তৈরীতে গান্ধীর অস্বীকৃতি জানানোর পরিনামের প্রেক্ষিতে হলো পুণা চুক্তি। এ ব্যাপারে গান্ধীর মতবাদ ছিল অস্পৃশ্যতা হলো ধর্মীয় বিষয় রাজনৈতিক নয়। গান্ধীর এ মতবাদের বিরুদ্ধে আলাদা নির্বাচক মন্ডলী গঠিত হলে গান্ধী স্পষ্ট আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন- আমার যতটা আধিপত্য আছে ততটা গুরুত্ব দিয়ে বলছি যে, একমাত্র আমি একাই এই বিষয়টির প্রতিরোধ করি তাহলে আমার জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করব।[৭] গান্ধী ১৯৩২ সালে আমরন অনশন শুরু করেন। 'হিন্দু ও মুসলমান, হিন্দু ও শিখ এবং হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের মনোমালিন্য হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যকার মনোমালিন্যের সাথে তুলনীয় নয়। এই মনোমালিন্য ব্যাপক ও গভীর। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার মনোমালিন্য ধর্মীয় সামাজিক নয়। আর হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মনোমালিন্য ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষমতা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে সেহেতু তাদের কিছুটা হলেও রাজনৈতিক রক্ষাকবচ থাকতে হবে- মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের জন্য যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম না হলেও কিছুটা সুবিধা দিতে হবে।[৮]

গান্ধীর অনশনে বিরোধিতাকারীরা নমনীয় হয়। পরে পুণা চুক্তি স্বক্ষরিত হয় । বাঙালি হিন্দু রাজনীতিকরা ঐ চুক্তির প্রতিক্রিয়ার বলে যে, বাঙলায় 'বর্ণ সমস্যা' নেই। তাদের ঐ দাবিটা কিছুটা যৌক্তিক ছিল। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে সেন্সাস কমিশনার উল্লেখ করেন যে, ' ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বর্ণ প্রথার বিষয়ে বাংলার অবস্থান কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে; কারণ এখানকার বর্ণ প্রথা ততটা উগ্র নয়।[৯] তবু কমিশনারের নিজস্ব মূল্যায়নে দেখা যায়, ব্রিটিশ বাংলার ৬০ লাখের বেশি লোককে অস্পৃশ্য হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। ডোম, ভুঁইমালি, হাঁড়ি ও কেউরাসহ ঝাড়ুদার ও মেথর ছাড়া তিনি কমপক্ষে অন্য ৪০টি শ্রেণীর নাম তালিকাভুক্ত করেন ' 'এদের সংস্পর্শে আসলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন হয়। ঐ তালিকায় পেশাগত শ্রেণী আছে, যেমন চামার ও মুচি - এরা বংশপরম্পরায় চামড়া পাকা করার কাজে নিয়োজিত এবং চামড়ার শ্রমিকের কাজ করে। সুঁড়িরা জড়িত মদ ব্যবসায়ের সাথে এবং পাটনি ও তিয়াররা জড়িত মাঝি ও জেলে পেশার সাথে - এদের সবার শ্রেণীগত স্বীকৃত পেশা এবং তাদের পেশাকে হিন্দু সমাজ ঘৃণার চোখে দেখত। এ তালিকার মধ্যে ছিল আদিম আদিবাসী গোষ্ঠী, যেমন, পশ্চিম বাঙলার বাগদি ও বাউরি এবং ময়মনসিংহের দালু, হাসি ও হাজং। এসব 'অস্পৃর্শ' গ্রুপ ছাড়াও সেন্সাস কশিনার আঠারোটি আদিম উপজাতি এবং অন্য আরও চল্লিশটি শ্রেণী বলে গণ্য করা হয়।[১০] তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থা এমন যে, ভোটাধিকার বিষয়ে তাদের বিশেষ কোনো সুবিধা দেওয়া না হলে তারা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যথেষ্ট প্রতিধিত্ব লাভ করতে পারবে না বা তারা তাদের স্বার্থ ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারবে না।[১১] এসব হল ছোটলোক; এরা ভদ্রলোকদের জমিতে ও বাসাবাড়িতে কাজ করে,

কিন্তু তারা বসবাস করে ভদ্র সমাজের গন্ডির বাইরে। বাঙলার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো রোয়েদাদ ও পুনা চুক্তিতে আভাস দেওয়া হয় যে, এতদিন ধরে ভদ্রলোক গ্রুপ দ্বারা প্রভাবিত সাংগঠনিক রাজনীতির আবদ্ধ গন্ডিকে ছোটলোকদের অন্তর্ভুক্তির জন্য উম্মুক্ত করা যেতে পারে। অস্পৃত্যতা যদিও ধর্মীয় কারণে সমাজে বিদ্যমান কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তা প্রভাবিত হয়েছে। সমাজের কুলীন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিল। জাত-পাত নিয়ে উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীরা যে নিজস্ব গন্ডী তৈরী করেছিলেন তাতে নিম্নবর্ণের প্রান্তিক মানুষজনের সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল। আর মুসলিম প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের গন্ডি ছিল প্রকট সীমিত। ফলে সমাজে বিদ্বেষ ছিল অনবরত উর্ধ্বগতি। এ বিদ্বেষ ক্রমাগত ধর্মীয় কারণ উৎড়িয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে উপনীত হয়েছিল।

সারণি ২: গ্রামীণ বাঙলায় শ্রেণী ও অর্থনৈতিক পার্থক্য[১৩]

	উচ্চ শ্রেণী	নবশক	মুসলমান	হরিজন	সাঁওতাল
শিক্ষিত (শতকরা হিসাব)	৫০	৩৩	১৮	৪	৩
ভূমিহীন পরিবার (শতকরা হিসাব)	১৮	১৩	২৫	৮৭	৯২
গড় সম্পদ (টাকার হিসেবে)	২৮২৩	১৫২৮	১০৮৩	৭৩	৭৬
ভূমির গড় মূল্য (টাকার হিসেবে)	২২২০	১৩৪০	১০৯৮	৩৮	৩৯
গড় বার্ষিক আয় (টাকার হিসেবে)	৪৩৬	২৩৬	১৭২	৮৪	৭৬

সূত্র : সামারি টেবল ফর ভিলেজ ইকনমিক সার্ভেজ, হাশিম আমীর আলী, রুবাল রিসার্চ ইন টেগরস শ্রেনিকেতন, মডার্ণ রিভিউ, খন্ড ৫৬, ১-১৬, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ৪২-৪৩

১৯৩০ সাল থেকে সমাজে বিক্ষিপ্তভাবে শ্রেণী সংঘাত, ধর্ম মতবিরোধ বাড়তে থাকে। বীরভূমের তিনটি ক্ষুদ্র সাঁওতাল বস্তি ও পাঁচ ধরনের পাঁচটি গ্রামের ৪৪৭ পরিবারের ওপর জরিপের তথ্য তুলে ধরা হলো।[১৪]

এ অবস্থার মধ্যে গান্ধীর মতাদর্শের অনুসারিগণ বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে থাকে। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পুরোহিতদের সহযোগিতায় তাদের আদর্শ পুরোদমে চালিয়ে যেতে পিছুপা হননি। হিন্দু উচ্চবর্ণীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের আচরণ সমাজে প্রবলভাবে বিভক্তি তৈরী করে। কাজের মধ্যে মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারন করলে তা থেকে উত্তরণের মুক্তিলাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সহজ বিষয় নয়। মানুষের মনে অসুস্থতা প্রশ্রয় পেলে কোনরকম দাওয়াই কার্যকর হয় না। কিছু মানুষকে যখন অস্পৃশ্যরূপে আখ্যা দেয়া হয় তবে চরম দ্বন্দ্ব অনিবার্য। সমাজে এধরনের ক্ষুদ্র বিভক্তি বৃহৎ আকার ধারন করা স্বাভাবিক। যেমন ব্রাহ্মণ সমাজের জন্য উৎপাদিত উদ্বৃত্ত খাবার প্রয়োজনে ফেলে দেয়া হবে কিন্তু নিম্নবর্ণের লোকদের দেয়া হবে না। এমন অবস্থায় অভূক্ত মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরী হয় তা বিক্ষোভে রূপ লাভ করা কি খুব অযৌক্তিক? শিক্ষিত হিন্দুদের পক্ষে আইন থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। মুসলিমদের জন্য একটি পথ খোলা ছিল তা হলো আন্দোলন। এ আন্দোলন ১৯৩৪ এর পর প্রবল আকার ধারন করে। এরপর আরো একটি ব্যাপার যোগ হলো বাঙলার প্রতি কেন্দ্রের অবহেলা। এই অবহেলা বাঙলার জনগণের পক্ষে সহজভাবে নেয়া অসম্ভব ছিল। এ সময় বাঙলার একপক্ষীয় আন্দোলনে শুধু হিন্দুরা জড়িত থাকে অধিকাংশ মুসলমান বিপক্ষে থাকে। ফলে কেন্দ্রে মুসলিমদের গুরুত্ব আরো কমতে থাকে।

১৯৩৫ সালে আইনসভার হিন্দু আসনের ৭৮টি পদের মধ্যে ১২টি আসন শহর এলাকার জন্য আর বাকি ৬৬টি আসন গ্রামাঞ্চলের জন্য নির্ধারন করা হয়। অপর পক্ষে মুসলিম ১১৭টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬টি শহর এলাকার জন্য বাকি ১১১টি আসন গ্রামাঞ্চলের জন্য অনুমোদন করা হয়। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গ্রামাঞ্চলের প্রাধান্য পেতে থাকে। গ্রামীণ মানুষের গুরুত্ব যতই বাড়তে থাকে মতদৈন্যতা ততই বাড়তে থাকে। হিন্দু মুসলমানদের যে সামাজিক আধিপত্যের পার্থক্য রয়েছে তা সামনে আসতে থাকে। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে অধিকার আদায়ের বিষয়টি প্রকট আকার ধারন করতে থাকে। এর আগে ১৯২৮ সালে এ কে ফজলুল হক কাউন্সিল প্রজা পার্টি নেতা নির্বাচিত হন এবং ১৯২৯ সালে বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। যার প্রথম সচিব নির্বাচিত হন মাওলানা আকরম খাঁ। ১৯৩৫ সালে প্রজা সমিতি বাঙলার মুসলমানদের একরূপ সর্বদলীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, সরকার-ঘেঁষা, সরকার-বিরোধী, সকল দলের মুসলমান রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর সমাবেশ ছিল এই প্রজা সমিতিতেই।[১৪]

লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করার পূর্বে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। হঠাৎ করে এ প্রয়োজন শুরু করেননি। তিনি এ লক্ষে ১৯০৪ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রভাবশালী মুসলিমদের সাথে বিস্তারিত বিষয়ে পর্যালোচনা করতে থাকেন। লর্ড কার্জন মুসলিমদের সুবিধার দিক গুলো তুলে ধরেন। মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য থাকলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে। ভারতবর্ষে এককালে যে মুসলিম সাম্রাজ্য তৈরী হয়েছিল সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা যাবে। ঐ অঞ্চলের মুসলিমদের মধ্যে এক ধরনের ক্রোধ তৈরী করার জন্য লর্ড কার্জন এ ধরনের প্রকল্প নিয়ে বিভক্তি তৈরী করার জন্য হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরীতে সচেষ্ট ছিল। মুসলিম নেতৃবৃন্দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আর্থিক সহযোগিতাতেও কার্জন এগিয়ে এসেছিল। হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারনের লক্ষে মুসলিম নেতাদের বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করে সামনে এগিয়ে দিতো। এছাড়া লর্ড বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন নেননি। অর্থাৎ হিন্দু- মুসলিম দ্বন্দ্ব তৈরীর জন্য বৃটিশ সরকার কোন নিয়ম মানার পক্ষে ছিল না। বৃটিশদের এ ধরনের কুরুচিসম্পন্ন মনোভাব সার্থকতায় পর্যবসিত হয় যখন দেখা যায় পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন শহরে দাঙ্গা প্রকট আকার ধারন করে। বরিশাল, চট্টগ্রাম, জামালপুর ও কুমিল্লায় দাঙ্গার স্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আসলে বৃটিশরা এসব করে সাম্প্রদায়িকতার বীজ স্থায়ীভাবে রোপন করে যায়। এ অবস্থায় মূলত হিন্দু- মুসলিম বিভাজনই করেনি। বৃটিশদের বিরুদ্ধেও আন্দোলনের সাংগঠনিকরূপ জোরালো হতে থাকে। মুসলিমরা হিন্দুদের থেকে দূরে যাবার সংকল্প নিয়েই থেমে থাকেনি। পাশাপাশি বৃটিশ পণ্য বর্জনের ঘোষণা দিয়ে আন্দোলন বেগবান করতে থাকে। নবজাগরণের পথ শুরু করে দিয়েছে বৃটিশরা নিজেই। যা পূর্ববাংলার মানুষ তথা সমগ্র ভারতবাসীকে নতুন রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছিল। এ অঞ্চলের মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে এতটাই সচেতন হতে থাকল যে তারা যে কিছুই অর্জনের এক দৃঢ় মনোবল অর্জনে সক্ষম হতে থাকল। ফলে হিন্দু- মুসলিম বিভাজনেরও একটি পথ তৈরী হতে থাকে। যদিও বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু- মুসলিমদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে যৌথ আন্দোলন হতে দেখা যায়। বাংলায় হিন্দু সমাজে জাতিগত দ্বন্দ্ব চিরকাল ধরেই চলমান। উঁচু শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা রয়েচে তা শ্রেণী সংগ্রামকে বেগমান করেছে। সক্রিয় হতে কাজ করেছে। ১৯২৪ সালে অস্পৃশ্যতা দূর করার লক্ষে হিন্দু ধর্ম সভা থেকে

ঘোষণা আসে। হিন্দু ধর্ম সভা আন্দোলন থেকে সমগ্র হিন্দুদের ওপর আহবান করা হয় যে মুসলমানরা যেমন অত্যাচারিত মুসলিমদের প্রতি সমবেদনা জানায় তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের ও সকল উঁচু ও নিচু সম্প্রদায়ের লোকদের এক হতে হবে। কিন্তু আদতে হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতিগত দ্বন্দ্ব এতই প্রকট ছিল যে ধর্মের দোহাই কার্যকর ছিল না। হিন্দুদের আধিপত্য বেশি সেই অঞ্চলে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিও হিন্দুরা ভাল চোখে নেয়নি। এছাড়া মুসলিমদের এলাকাতে যখন হিন্দুদের ক্ষমতা খর্ব হতে থাকে তাও ভালভাবে নেয়ার কথা না। হিন্দুরা আসলে একটা কষ্টকর অবস্থার মধ্যে আছে কারণ নির্বাচনের ফলে এবং বিলম্বিত রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মনোনয়নে দীর্ঘদিন যাবত হিন্দু জমিদার কর্তৃক দখল করা চেয়ারম্যানের পদ প্রায় অখ্যাত এমন এক মুসলমান উকিলের কাছে চলে যাবে যিনি আইন সভায় সরকারকে সমর্থন করেন। রাজশাহী জেলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর হিন্দু জমিদার ও ক্ষুদ্র তালুকদারেরা সব সম্পত্তির মালিক এবং ভাষা সংস্কৃতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে, এ কথা মনে করলে এটা অস্বাভাবিক নয় যে, তাদের সংরক্ষিত এলাকার কেউ দখলের হুমকি দিলে তা গভীরভাবে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করবে।[১৫]

অন্যদিকে মুসলিম প্রধান এলাকায়ও একই ভাবে হিন্দুদের বিরাজমান আধিপত্য লাঘব করার জন্য মুসলিমরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসে। সভা সমিতি থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে মুসলিমরা হিন্দুদের শুধু নিরুৎসাহিত করেনি সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোটে প্ররোচিত করা হতো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত হিন্দুদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়ায় সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তুলনামূলক শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের চলে যাওয়ায় দুই দিকেই অসন্তোষ দেখা দেয়। হিন্দুদের কর্তৃত্ব হারানোর ফলে সামাজিকভাবে তারা সমাজের হেয় প্রতিপন্ন হতে থাকে। ফলে এ শিক্ষিত লেখকদের প্রভাব মুসলিমদের বিপক্ষে যেতে থাকে। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে নতুনভাবে নেতৃত্বের ভার চলে আসায় তাদের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহনে আগ্রহী লোকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরী হতে থাকে। এ অবস্থায় সঠিক নেতৃত্বের অভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। মুসলিমদের একাংশ হিন্দুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকে। এতে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার ধারন করতে থাকে। তা পূর্ব বঙ্গের বড় বড় শহর গুলোতে বিস্তৃতি পায়। বর্ধমান মুর্শিদাবাদ এলাকায় মুসলিমদের ধর্মীয় আয়োজনে বাধা পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক অবস্থা আরো চরমে পৌঁছে। ভারতবর্ষের কিছু জায়গায় মুসলিম ধর্মীয় আয়োজনই যেখানে প্রশ্নের সম্মুখীন পূর্ববঙ্গের বিভিন্নপ্রান্তে দাঙ্গায় রূপ লাভ করা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙা চরম আকার ধারণের ফলে বাঙলা ভাগ হতে সময়ের ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। হিন্দু মুসলিম ভাগের সুযোগ হয়। শুধুমাত্র হিন্দু মুসলিমদের রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে হাজার মাইল দূরের দুই ভূখন্ডকে এক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। তা যে অযৌক্তিক ও অসমীচীন তা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীতে ভারতকে মাঝে রেখে শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র গঠন যে কিছু উর্বর মস্তিষ্কের কাজ তা শুরুতেই টের পাওয়া যায় রাজধানী গঠন নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজধানী হওয়া উচিত ছিল ঢাকা। পূর্ববাংলাকে ঔপনিবেশিক শোষণ নির্যাতন করার হাতিয়ার বানানোর জন্যই দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা পাকিস্তানের জাতির জনকের জন্মস্থান করাচিকে রাজধানী করা হয়। জিন্নাহর মৃত্যুর কিছুদিন পর পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জেনারেল আইয়ুব খানের বাসভূমি পাঞ্জাবের

রাওয়ালপিন্ডিকে করা হয়। রাজধানী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তও সঠিক নয় তা বুঝতে পেরে আবার পরিবর্তন করে ইসলামাবাদকে রাজধানী করা হয়। এভাবে পাকিস্তানের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র আধিপত্য বিস্তার নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকত। এই আধিপত্য বিস্তারের মূল হাতিয়ার ছিল ধর্ম। যে ধর্মের নামে পাকিস্তানে এখনো হাজার হাজার প্রাণ দিতে হয়। সারাবিশ্বে ইসলামী জঙ্গি সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুরুতেই পাকিস্তানের নাম চলে আসে। ক্ষমতার জন্য ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করেছিল পাকিস্তান, অথচ তৎকালীন ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে পরিপূর্ণ ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক বিবেচনা করে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থান পেছনে থাকাতে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের ব্যাপারে সোচ্চার হলেই ভারতের দালাল প্রয়োজনে কাফের বলে গালি দিতে দ্বিধা করেনি। ধর্মের দোহাই দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক মানুষের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর বিরোধীতা করে যখন ঢাকায় ছাত্ররা মিছিল মিটিং করে ১৯৪৮ সালে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে শুধু মাত্র উর্দু ও ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম ভাষা হিসেবে গণ্য করার চরম সমালোচনা ও কটুক্তি করেন। পশ্চিম পাকিস্তানীদের চরম নেতিবাচক দিকটি হলো প্রয়োজনে ধর্মকে অপব্যবহার করা। অথচ তাদের মধ্যে ধর্মের চেয়ে অধর্ম বেশী পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম কখনো মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার সমর্থন করে না। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা বাংলাকে কাফেরদের ভাষা হিসেবে আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি পশ্চিম পাকিস্তানীরা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানের এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫১ সালে বলেন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে চাপিয়ে দিলে তা হবে গণহত্যার সামিল। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি আশান্বিত হতে থাকে। বাঙালি জাতি চিরকাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল তাদের নিজস্ব সম্পদ পাবার অধিকার কখনো পায়নি আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে।

এ ধরণের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রথম কৌশলী ডাক বঙ্গবন্ধু প্রথমে ৬ দফার মাধ্যমে দিয়েছিলেন যা স্বাধীনতার নামান্তর। বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ৬ দফা নিম্নরূপ : [১৬]

১. পাকিস্তান হইবে একটি "ফেডারেশন" বা যুক্তরাষ্ট্র। এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। সরকার হইবে "পার্লামেন্টারি" ধরনের, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইন সভা হইবে সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আসন সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা দুইটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকিবে নিরঙ্কুশ।

৩. সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকিবে।

অথবা

বিশেষ ব্যবস্থার শর্তাধীনে মুদ্রা ও অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন "স্টেট ব্যাংকের" পরিচালনার অধীনে দুই অঞ্চলে দুইটি "রিজার্ভ ব্যাংক" থাকিবে। এই আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংকগুলি আঞ্চলিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবে এবং যাহাতে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হইতে না পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে

৪. শাসন সম্বন্ধীয় কার্যনির্বাহের সুবিধার জন্য এবং নানা প্রকার জটিলতা এড়াইবার জন্য কর ও শুল্ক ধার্যের দায়িত্ব অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির উপরই ন্যস্ত থাকা বাঞ্জনীয়। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে কোনো ক্ষমতা অর্পণের প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির রাজস্বের একটি স্বীকৃত অংশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অবশ্য প্রাপ্য হইবে। অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বয়ংক্রিয় নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তহবিলে জমা হইবে।

৫. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাইবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বীয় স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দান করিতে হইবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্র অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের চাওয়ার ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফার দাবী তুলে ধরা হয়েছিল। এ ৬ দফার ওপর ভিত্তি করেই পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সাধারণ জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন অর্জন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের জান্তা সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চাওয়াকে থোরাই কেয়ার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ নানাবিধ জুলুম অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়। এহেন অবিচারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জেগে উঠলে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে ১৯৬৯ সালে। পাকিস্তান যে বর্বর জাতি গণতন্ত্র তাদের ধাতে নেই। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত কোন প্রধানমন্ত্রী তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। আরেক সেনাশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের মাত্রা বুঝতে পেরে সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের গণতন্ত্রের ইতিহাসের প্রথম সোপান যা এর আগে ঘটেনি। এ ঐতিহাসিক নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির জন্য এক গর্বের অধ্যায়। এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

সারণি-১

নির্বাচনী ফলাফল ১৯৭০-৭১ (জাতীয় পরিষদ)[১৭]

দল	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	সীমান্ত	বেলুচিস্তান	উপজাতি এলাকা	মহিলা	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০						৭	১৬৭
পিপিপি		৬৪	১৮	১			৫	৮৮
কাইয়ুম লীগ		১	১	৭				৯
কাউন্সিল লীগ		৭						৭
হাজারভী জমিয়ত				৬	১			৭
থানবী জামাত		৪	৩					৭

ওয়ালী ন্যাপ				৩	৩		১	৭
জামাতে ইসলামী		১	২	১				৪
পিডিপি	১							১
কনভেনশন লীগ		২						২
স্বতন্ত্র	১	৩	৩			৭		১৪
মোট	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

১৯৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ ১৬২ আসন পায়। পক্ষান্তরে পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানের ০৪টি প্রদেশ থেকে মোট ৮৮টি আসন পায়। এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার নানা বাহানা করে অত্যন্ত নক্কারজনকভাবে জেনারেল ইয়া হিয়া ভূট্টকে ক্ষমতায় বসানোর পায়তারা করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এক হয়। মূলত নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই পূর্ববাংলার জনতা বিভিন্ন পদক্ষেপে সামিল হয়েছিল।

সারণি-২
নির্বাচনী ফলাফল ১৯৭০-৭১[১৮]
(প্রাদেশিক পরিষদের মহিলা আসনে নির্বাচন হয়নি)

দল	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	সীমান্ত	বেলুচিস্তান	উপজাতি এলাকা	মহিলা	মোট
আওয়ামী লীগ	২৮৮							২৮৮
পিডিপি	২	৪						৬
ওয়ালি ন্যাপ	১			১৩	৮			২২
জামায়াতে ইসলামী	১	১	১	১				৪
থানবী জামাত	১							১
পিডিপি		১১৩	৩২	৩				১৪৮
কাউন্সিল লীগ		১৫	৫	১				২১
কাইয়ুম লীগ		৬	৪	১০	৩			২৩
কনভেনশন লীগ		৬		২				৮
আহলে হাদিস		১						১
হাজারভী জমিয়ত		২		৪	২			৮
জমিয়তে আহলে সুন্না		৪	৭					১১
সিন্ধু এমপিপিএমএম			১					১
পাখতনিস্তান ন্যাপ					১			১
বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট					১			১
স্বতন্ত্র	৭	২৮	১০	৬	৫			৫৬
মোট	৩০০	১৮০	৬০	৪০	২০			৬০০

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন আমজনতার প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ ভোট। এর আগে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল ধর্মের নামে প্রহসনের নির্বাচন। যে নির্বাচনের জন্য ১৯৫৩ সালেই এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাষানী এবং হোসেন সোহারাওয়ার্দির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে একটি জোট তৈরী করেন। তৎকালীন অত্যাচারী শাসক চক্রের একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে সরকার চালাতে গিয়ে জুলুম ও নিপীড়নের মাত্রা এতোটাই চরমে ছিলো যে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। হিন্দু মুসলিম বিভাজনের এই ভোটে মুসলিমদের আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিমদের আসন ছিল ৭২টি। ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফুন্ট পেয়েছিল ২২৮টি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ১২ মার্চ শেষ হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের কুমতলব সামনে আসতে থাকে। বাঙালিদের শাসন কোনমতেই পশ্চিম পাকিস্তানের উর্বর নেতৃবৃন্দ মানতে পারছিলো না। ফলে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের গঠিত মন্ত্রিসভা বাতিল করে

দেয়। এর বদলে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন চালু করে। গভর্নর শাসিত সরকারের মাধ্যমে শোষণের মাত্রা পুরোদমে চালু করতে না পেরে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন চালু করে। পাকিস্তানীদের মধ্যে ক্ষমতার নেশা বড় মারাত্মক। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই একই বছর জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এই সামরিক জান্তার অত্যাচারের তীব্রতার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জনমানুষের জীবন ত্রাহি অবস্থায় পর্যবসিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলে যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অভূতপূর্ব সাড়া দেবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইয়াহিয়ার প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগ যে তথ্য নির্বাচন সম্পর্কে দিয়েছিল তা আকাশ-কুসুম অমিল পাওয়া যায়। অবশ্য আওয়ামী লীগ ও যে ফলাফল প্রত্যাশা করেছিল প্রকৃতপক্ষে ফলাফল ছিলো তার চেয়েও ভালো। অর্থাৎ প্রায় শতভাগ আসন পায়। ফলে এই ফলাফল যে পাকিস্তানরা মানবে না তা পূর্বে আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই প্রতীয়মান হওয়া যায়। এ অভাবনীয় বিজয়ের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তিতে অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে চলে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ৬ দফা ও ১১ দফা আদায়কল্পে দৃঢ় মনোবল হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬১টি আসনই আওয়ামীলীগ (১টি পিডিপি'র অপর দিকে পশ্চীম পাকিস্তানরে ১৩১টি আসনের মধ্যে পিপলয় পার্টি ৮৩টি আসন লাভ করে এই পার্টির নেতা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি কমিটি তৈরী করে বসে। যা গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী সমীচীন নয়। এ দিকে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জানান দেন পূর্ব পাকিস্তানের জনতার রায় স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্পষ্টভাবে অনুধাবন করে ভোটের মাধ্যমে জয়লাভ যে অধিকার আদায় নয়। কারণ পাকিস্তানে অবস্থানরত কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে নেক্কারজনকভাবে বৈষম্য আচরণ করে যাচ্ছে তাতে নির্বাচনে জয়লাভ করেই যে ক্ষমতা পাওয়া যাবে তা দূরাশই থেকে যেতে পারে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তিতে সংগ্রামের পরিকল্পনা করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনযুদ্ধের ইঙ্গিত সংবলিত ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের টনক নড়ে। ফলে জানুয়ারির দুই সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান দু'দফা বৈঠক করে। এ সময়ে ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে নমনীয় করার জন্য দুমুখী অভিযান শুরু হলো। তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখানো হলো। আমলা ও অর্থনীতিবিদরা বলতে শুরু করলেন যে, এবারে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের পালা এবং এতে বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা জরুরি। একই সঙ্গে সামরিক বাহিনীর দাবি সম্বন্ধেও ভয় দেখানো হলো। সামরিক বাহিনী প্রদেশের বাজেট অনুদানের ওপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। সম্পদের ওপর তাদের নিজেদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের খাতিরে ফেডারেল সরকারের রাজস্ব ক্ষমতার প্রয়োজন। জেনারেল ইয়াহিয়া ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে এই দুইটি বিষয়েই তাঁকে সাবধান করে দেন। সাংবিধানিক সমঝোতার ব্যাপারে তিনি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপের বিষয়টি তুলে ধরেন। ১৪ জানুয়ারি ঢাকা ছাড়ার প্রাক্কালে তিনি

জানান যে, তাঁর আলোচনা সন্তোষজনক এবং তিনি প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিবেবে আখ্যায়িত করেন।[১৯]

কিন্তু ইয়াহিয়া ছিল অত্যন্ত দূরভিসন্ধিমূলক। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি এসব কথা বলে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে দেখা করে যায় তা কুষ্টিগত করার নীল নকশা আঁকতে থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া পরবর্তীতে বোল পাল্টে পাকিস্তানের পরবর্তী সরকার প্রধান কে হবেন তা অস্পষ্ট করে ফেলেন। কারণ জেনারেল ইয়াহিয়া ভিতরে ভিতরে জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে সমঝোতা করে ফেলেন। তখন অনাহত অতিরিক্ত ভারত বিরোধী আচরণ করতে শুরু করেন। মুসলিমদের পক্ষে কথা বলে একটা আলাদা মুসলিম সেন্টমেন্ট তৈরী করতে থাকেন ভূট্টো। তিনি এমন পরিস্থিতি তৈরী করেন যাতে মানুষ মনে করে ভারতই পাকিস্তানের শত্রু। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ধম্রজাল তৈরী করে। ভূট্টো ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার লক্ষ্যেই অসত্যের আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতায় বসার অলীক চিন্তায় পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের ওপর নির্বিচারে নারকীয় হত্যাকান্ড চালানোর নকশা ইয়াহিয়ার সাথে করতে থাকে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারির ২৮ তারিখে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে জুলফিকার আলী ভূট্টোর বৈঠকে কিছু আশান্বিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ। ইসলামাবাদ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি সরকারি বার্তায় জানানো হয় ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এ অধিবেশনই দেশের পরবর্তী গন্তব্য নিশ্চিত হবে ভেবে রেখেছিল পাকিস্তানবাসী। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও প্রস্তুতি রেখেছে যে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থির সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, নির্বাচন ইশতেহারে উল্লিখিত পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণ তাঁর ওপরে যে ভরসা রেখেছে তার ব্যর্তয় ঘটবে না। ঠিক সেই প্রত্যয় নিয়েই ১৬ ফেব্রুয়ারি সংসদীয় দলের বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর পার্লামেন্টের নেতা নির্বাচন করা হয়। সেইমতো একটি ছায়া সরকার গঠিত হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং সংসদের ডেপুটি নেতা হিসাবে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নির্বাচন করা হয়। এ অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ কুটবুদ্ধি পাকাতে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। এর মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৫ফেব্রুয়ারি স্পষ্ট ষোষণা করেন আগামী ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে ঢাকা যাবেন না। শুরু হলো প্রকাশ্যে বিরোধ। ভূট্টো পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে থাকেন। সরকার গঠিত হলে পূর্ব পাকিস্তানকে পরবর্তীতে কতটুকু শায়ত্বশাসন দেয়া উচিত আর দিলে ফলাফল কী হবে তা নিয়ে সমালোচনা করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু ও এর জবাব দেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন নিতে সম্মত না হলে তা স্বাগত জানানো হবে। তবে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন পূর্ব ঘোষিত ৬ দফার ভিত্তিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অযাচিত আচরণে পূর্ব পাকিস্তানীরা কঠোর অবস্থানে আসতে বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে অফিস আদালতে এর প্রভাব পড়তে থাকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এস এম আহসান কট্টরপন্থী কম হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তাঁকে সরিয়ে কট্টরপন্থী সামরিক বাহিনী থেকে লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে আনা হয়। ইয়াকুব খান ক্ষমতায় বসেই পাকিস্তানের জান্তা সরকাররের মনপূত কাজ করার জন্য উৎগ্রীব

হয়। পাকিস্তানের সামরিক আইন আরো কঠোরতর করতে থাকে। অফিস-আদালত থেকে শুরু করে সংবাদপত্রসহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্ত অবস্থান নিয়ে নেয় এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের গৃহীত পদক্ষেপ নস্যাত করার লক্ষ্যে অমানবিক আচরণ শুরু করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তা আচ করতে পারে। এতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অফিস আদালত যানবাহন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব বাংলার জনগণ ও দিশাহীন অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু অবিবেচকের মতো কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারছেন না। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তারিখের নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টই আকস্মিকভাবে ১ মার্চ পাকিস্তান বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ঘোষণা করেন '৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিবার্য কারণবশত: অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হলো'। এ ঘোষণা আসার পর পূর্বানী হোটেলে সরকার পরিচালনার বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে নেতাকর্মীদের ব্যস্ত থাকাকালীন সময়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর কাছে এসে পরবর্তী অবস্থান জানতে চাইলে তিনি সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ সময়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান ও বিশ্ব একাদশের সাথে চলকালীন ক্রিকেট ম্যাচ জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় মুহূর্তে খেলা পন্ড হয়ে যায়। ক্রীড়ামোদী জনতার সাথে দিলকুশা, মতিঝিল, পল্টন ও গুলিস্তান এলাকায় অবস্থানরত জনতার সাথে আমজনতার ঢল নামে। অশান্ত জনতা গুলিস্তান ও নাজ সিনেমার হলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথামতো চলছিল তা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বুঝতে বাকী ছিলো না। জেনারেল ইয়াহিয়ার এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাদেশে ২ ও ৩ মার্চ হরতাল আহবান করে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে সবুজ জমিনে লাল সূর্য ও ভেতরে সোনালী রঙে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছাত্রসমাজের এ সিদ্ধান্তে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তানের জান্তা সরকার ছাত্রজনতার ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এ হামলার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুর কাছে স্পষ্ট নির্দেশনা শুনতে চায়। নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষনের প্রতিবাদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে বাঙালির প্রতিরোধের ক্ষমতা ও তাদের স্বাধীনতা লাভের সংকল্পের কথা তুলে ধরেন। ২ ও ৩ মার্চের সর্বাত্মক হরতাল দেখে পাকিস্তানের জান্তা সরকারের টনক নড়ে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আবার ভুট্টোর পরামর্শে বেতার ভাষণের মাধ্যমে ১০ মার্চ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সম্মেলনের ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু জান্ত সরকারের ফাঁদে পা না দিয়ে ঐ দিনই পল্টন ময়দানে আওয়ামীলীগের উদ্যোগে মহাসমাবেশের আয়োজনের আদেশ দেন বঙ্গবন্ধু। এ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেন,'বাংলার গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে না নিলে বাংলার মানুষ সরকারকে সহযোগিতা করবে না, কর- খাজনা দেবে না।' এ মহাসমাবেশ থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখাসহ একটি

পূর্ণাঙ্গ ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। এ সমাবেশ থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটির প্রথম দশ লাইন নির্বাচন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ 'স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা থেকে বাংলাদেশের পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের ব্যাপারে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত আসে। যা বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ সমর্থন থাকে। ২ মার্চ ছাত্রলীগের উদ্যোগে বটতলায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশেই এখন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়। পাকিস্তানের জান্তা সরকারের কঠিন সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা যখন শঙ্কিত তখন বঙ্গবন্ধু ব্যাথাতুর কণ্ঠে বলেন, 'আমি মরে গেলেও ৭ কোটি মানুষ দেখবে দেশ সত্যিকারের স্বাধীন হয়েছে। তিনি বলেন, হয়তো এটাই আমার শেষ ভাষণ। আমি যদি নাও থাকি আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলন যাতে না থামে। তিনি অফিসে- আদালতে যাওয়া এবং কর-খাজনা দেয়া বন্ধ রাখতে বলেন। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করলে তিনি তা লঙ্ঘন করার নির্দেশ দেন।[২০]

বঙ্গবন্ধু বলেন, দানবের সাথে লড়াইয়ে যে-কোনো পরিণতিকে মাথা পেতে বরণের জন্য আমরা প্রস্তুত। তেইশ বছর রক্ত দিয়ে এসেছি। ' প্রয়োজনে বুকের রক্তে গঙ্গা বহাইয়া দিব'। তবু সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বাংলার বীর শহীদদের রক্তের সাথে বেইমানি করব না'।[২১]

পল্টন ময়দানে যে ইশতেহার পাঠ করা হয়, তাতে ছাত্রলীগের প্রথম ইশতেহার স্মারক দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তা 'স্বাধীনতার ইশতেহার' নামে পরিচিত হয়।

১. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে :

৫৪ হাজার ৫শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ।

ক. পৃথিবীর বুকে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা

খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষকরাজ- শ্রমিকরাজ কায়েম করা।

গ. বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম

২. বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে :

ক. প্রতিটি অঞ্চলে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন

খ. জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা।

গ. মুক্তিবাহিনী গঠন।

ঘ. সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার।

ঙ. লুটতরাজ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধকরন

৩. স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা হবে নিম্নরূপ :

ক. বর্তমান সরকারকে বিদেশি সরকার গণ্য করে সকল আইনকে বেআইনি বিবেচনা

খ. অবাঙালি সেনাবাহিনীকে শত্রুসৈন্য হিসেবে গণ্য এবং এদের খতম করা

গ. এদের সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ

ঘ. আক্রমণরত শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ

ঙ. বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী সৃষ্টি নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা

চ. স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' ব্যবহৃত হবে।

ছ. পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জন ও সর্বাত্মিক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা

জ. পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা ব্যবহার

ঝ. স্বাধীনতা সংগ্রামরত বীরদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।[২২]

৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের মুলতবী সভায় ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ব্যখ্যা করেন। ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় মিছিল সমাবেশ করলে শাসকগোষ্ঠীর হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটে। ৫ মার্চ ঢাকার অদুরে শিল্প এলাকায় সামরিক জান্তা ৪ জনকে হত্যা করে। এরপর এর ফলে পরবর্তি দিন হরতাল পালিত হয়। ৬ মার্চ দুপুরে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বেতারের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে জানান যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের সমাবেশ বসবে। ৬ মার্চেই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে আবার পরিবর্তন করে লে.জেনারেল টিক্কা খানকে করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার আরো কঠোর অবস্থান নেয় যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য অসহনীয় দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ৭ মার্চ হলো অবিস্মরীয় দিন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পিছনে এদিনটি অসায় হয়ে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। বাঙালি জাতিস্বত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য আজন্ম স্মরণীয় হয়ে উজ্জল থাকবে রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের জাতির পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয়েক লক্ষ বিপ্লবী জনতার সামনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দেন। ঐ দিন প্রতীক্ষিত জনতা বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা শোনার জন্য হাজির হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এমন কিছু বলেন যা স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা নয় তবে স্বাধীনতা পেতে গেলে বাঙালিরা কী করতে হবে এবং কিভাবে করা উচিত তা মাত্র ১৯ মিনিটে বিস্তারিত বলেন :

ভায়েরা আমার,

আজ দু:খ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দু:খের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম? (আপনারা) নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে (আপনারা) ভোট দেন। আমরা ভোট পাই। আমরা দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি

বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি দু:খের বিষয়, আজ দু:খের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলায় অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল 'ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো-আপনারা জানেন। দোষ কি আমাদের? (আজকে তিনি) আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনারা জানেন, আলাপ-আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদে অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে, তিনি মেনে নিলেন । (তিনি) তারপরে আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা এসেমব্লিতে বসবো, আমরা আলোচনা করবো। আমি বললাম বক্তৃতার মধ্যে, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

তারপরে জনাব ভূট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর নেতাবৃন্দের সাথে আলাপ করলাম- আসুন, বসি। জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে ছয় দফা-এগার দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে, এটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই। আপনারা আসুন, বসুন, আমরা (আমরা) আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে (আমাদের) আমাদের ওপরে তিনি দোষ দিলেন, এখানে আসলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তারপরেও যদি কেউ আসে তাকে ছন্নছাড়া (ছন্নছাড়) করা হবে। আমি বললাম, এসমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাব। ভূট্টো সাহেব ললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে

দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে- যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না। তারপরে বন্ধ করে দেওয়ার পরে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল, আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমাদের (যাদের) অস্ত্র নাই (আমাদের হাতে), জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিবদুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই দেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই, আমি বলেছি তাদের কাছে এ কথা, যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে, তা থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।

তারপরে উনি বললেন (যে আমার বলেছেন), আমি নাকি (বলে) স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে এ কথা বলে দেবার চাই-আমি তাকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়, তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুয়ের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে, কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তারপরে আপনি ঠিক করুন-আমি এই কথা বলেছিলাম।

তিনি বললেন, (আমি নাকি তাকে) তিনি নাকি খবর পেয়েছিলেন (নাকি) যে আমি আরটিসিতে বসব। আমি তো অনেক আগে বলেছি যে কীসের আরটিসি, কার আরটিসি, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? আপনি আসুন, দেখুন, জাতীয় পরিষদের জন্য আমার লোকেরা রক্ত দিয়েছে। (সত্য কথা .. তারপরে আজকে আজকে আমার যখন... এসেমব্লি ... দেবেন তিনি ২৫ তারিখে এসেমব্লি ... এরপরে আপনারা জানেন, আমি কলাম, আমি কলাম ... পল্টন ময়দানে ... আমি বললাম , সবকিছু বন্ধ ... আমি বললাম, সবকিছু বন্ধ, সরকারি অফিস বন্ধ ...আমি বললাম, ... আমার কথা তারা মানলো, তখন আমাকে বলল, এই আপনারা আমাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, আপনারা আমি বললাম, কোন সরকারি অফিস চলবে না। কোনো কিছু চলবে না। তবে কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হবে, আমি ডিসকাস করলাম যে, এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেইভাবে চলল।) *

আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে ৫ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেমব্লি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন। আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের (উনি ... দিলেন ... রাষ্ট্র কার ...?) গোলমাল হলো উনার

পশ্চিম পাকিস্তানে, গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে। আমি পরিস্কার মিটিংয়ে বলেছি, এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ভায়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে এসে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন, 'মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর, জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব, আমরা এসমেব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে, এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসা, (আমরা) এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না। জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।

ভায়েরা আমার,

(তোমরা) আমার ওপর বিশ্বাস আছে? (...জনতার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ...) আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব- আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আপনরা জানেন, আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালেন জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের-গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য যে যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল-কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, (তারপর আর কী?) সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা-কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়-তোমাদের (উপর) কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগ অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, অন্য যারা এজন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন,

মনে রাখবেন। আর সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্টে বা জজকোর্টে দেখা না হয়। দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো-কেউ দেবে না।

আপনারা আমার ওপর ছেড়ে দেন, আন্দেলন কী করে করতে হয়। শোনেন, মনে রাখবেন, একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, পাইক ঢুকেছে, নিজেদেরে মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়-মনে রাখবেন।

দ্বিতীয় কথা হলো এই-যদি আবার কোনো রকমের কোনো আঘাত আসে, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে, মনে রাখবেন-একটা কথা অনুরোধ করছি, (এটা অত্যন্ত শক্ত কথা এই যে, কিন্তু) সামরিক বাহিনীর লোকেরা কোনো যায়গা থেকে অনর্থক ঘোরাফেরার চেষ্টা করবেন না। তাহলে দুর্ঘটনা হলে আমি দায়ী হব না।

প্রোগ্রামটা বলছি আমি, শোনেন। রেডিও, টেলিভিশন, নিউজ পেপার-মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা-যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। (রেডিওতে যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয় কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। টেলিভিশনে যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না) দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নেবার পারে, কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাস হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন, আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ভায়েরা আমার,

(আমার কাছে) এখন শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে, (এই-) আপনারা আমার এইগুলি চালায়ে দেন, কারো হুকুম মানতে পারবেন না। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না, জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না। যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।

দ্বিতীয় কথা- প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন

দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা।[২৩]

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এ ভাষণটি ছিল শত শত বছর ধরে অধিকার বঞ্চিত মানুষের পরম আকাঙ্খার উচ্চারণ। বাংলাদেশের মানুষের মনের কথাগুলো তুলে ধরে এর সমাধান কীভাবে করতে হবে তা স্পষ্টভাবে খুব অল্প সময়ে কবিতার মতো তুলে ধরেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কার কী দায়িত্ব এবং কিভাবে করলে তার চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়া যাবে তা সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের জনগণের করণীয়তার পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর অনুস্থিতিতে ও কিভাবে করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে স্বল্প সময়ে বলে দেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি এতোটাই মহুমাত্রিক যে, ১৮৬৩ সালে আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ এড্রেস' এবং ১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার কিং এর 'আই হ্যাঙ এ ড্রিম' এতোটা ছিলো না। বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তার কারণ পাকিস্তানের জান্তা সরকার কামান ট্যাংক নিয়ে প্রস্তুত ছিলো। যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় তবে দেশদ্রোহী হিসেবে সকল নেতাকর্মীর ওপর হামলা করা হবে। এতে বঙ্গবন্ধুসহ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হতো। মোট কথা বাংলার জনগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ভবিষ্যত সকল নির্দেশনা পেয়ে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলো স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ রেডিও টিভিতে প্রচারের ফলে পরবর্তীতে বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মনে প্রাণে ধারণ করে যার যার দায়িত্ব পালনে ব্রত হয়। অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার জনগণ সামিল হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের কড়া কার্ফুসহ সামরিক নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঢাকার রাজপথ বিক্ষোভ মিছিলে সাওয়ার হয়। এ অবস্থায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। তিনি ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। আরো আলোচনার প্রয়োজনে ১৭ মার্চ দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হন। আলোচনার কোন প্রকাশিত ফলাফল আসেনি। ১৯ মার্চ পুনরায় ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধু বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে কোন ফলাফল তো হলোই না বরং সেনাবাহিনী ঢাকার কিছু অংশে গুলি চালায়। এতে বিশজনের অধিক লোক নিহত হন। ২০ মার্চ চতুর্থ দফা বৈঠকে বসে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি তাই জেনারেল ইয়াহিয়া জুলফিকার আলী ভূট্টোকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এতে বাঙালি নেতৃবৃন্দকে অনুসরণ করতে পারে যে, এসবই দূরভিসন্ধিমূলক। ২২ মার্চের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত হন যে, এসবই প্রতারণা। তাই তিনি বাঙালিকে সাবধান হওয়ার ইঙ্গিত দেন। তা স্পষ্ট হয় ২৪ মার্চ ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি চূড়ান্ত হলে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এম, এম আহমদ বিষয়টি খসড়া চূড়ান্ত করার কথা ছিলো। কিন্তু তিনি হঠাৎ ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ ভূট্টো ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রকাশ্যে অসম্মতি জানালে অবধারিত মুক্তিযুদ্ধ শুরুর বিষয়টি স্পষ্ট হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেনাবাহিনী নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে দেয়। ইয়াহিয়ার নীল নকশা অনুযায়ী ২৫ মার্চের কালোরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজার বাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানাসহ বিভিন্ন জায়গায় নির্মম হত্যাকান্ড চালায় যা অপারেশন সার্চ লাইট নামে অভিহিত। ২৫ মার্চের কালোরাত্রিতে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত সহচর জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে রাত্রির ১ টা থেকে ১.৩০ মিনিটের মধ্যে গ্রেফতার

করা হয়েছিল। ২৫ মার্চের রাত্রের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ইপিআর এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[২৪] শেখ সাহেবের প্রথম বার্তাটি আর একটি উৎস থেকেও চট্টগ্রামে উপনীত হয় ২৫ মার্চের মধ্যরাত্রির পর ১-১০ মিনিটে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ব্যাপক প্রচার ছিলো না। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণা যে আমজনতার জন্য বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন তা অনুধাবন করে ২৬ মার্চ আনুমানিক ২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম শহরের সন্নিকটে কালুরঘাটে চট্টগ্রাম রেডিও'র ট্রান্সমিশান সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বেলাল মোহাম্মদকে নাম ঘোষণা করার জন্য বলা হলে তিনি বলেন যেহেতু একটি গুপ্ত কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হচ্ছে তাই নাম না বলাই ভালো এ জন্য এম এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধুর নামে পাঠ করেন। পরবর্তীতে ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে একজন সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে মেজর রফিকুল ইসলামকে বলা হলে তার পরামর্শে মেজর জিয়াউর রহমানকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করানো হয়।

এ দিকে ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইট বাংলাদেশের গণহত্যার কিছুক্ষণ আগে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মত তার অবর্তমানে কর্তব্য পালন করার জন্য তাজউদ্দিন আহমদ ২৭ মার্চ রায়ের বাজার হয়ে কামারখালী-মাগুরা-ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা হয়ে মেহেরপুর পৌঁছেন। এ সময় তিনি মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ও এসপি মাহবুব প্রমুখের সাথে বৈঠক করেন। তাজউদ্দিন ৩১ মার্চ কলকাতা পৌছলেন। কলকাতার আসাম হাউজে একদিন থেকে ১ এপ্রিল একটি রুশ বিমানে দিল্লী পৌছেন। সাথে ছিল ব্যারিস্টার আমির উল ইসলাম। বাংলাদশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ও সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন আহমদের বৈঠক সার্থক হয়েছিল। মিসেস গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আর্থিক সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্নভাবে এসেছে। কামার-চাষী থেকে শুরু করে শীর্ষ পর্যায়ের লোকটিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোন না কোনভাবে যুক্ত ছিল। নীতিগত কারণে ভারত ০৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও প্রথম দিক থেকে সরকার উদারচিত্তে সহযোগিতা করে গেছে। বাংলাদশেকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় উপসম্পাদীয় যেভাবে নির্মোহচিত্তে সমর্থন দিয়ে সরকারের প্রতি আকুতি জানিয়েছেন প্রখ্যাত সাংবাদিকগণ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী পর্যায়ের মানুষগুলো মনে প্রাণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছেন। একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো নদীয়া জেলার তৎকালীন জেলা ম্যাজেস্ট্রেট দীপক কুমার ঘোষ এর নেতৃত্বে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে নদীয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় একাদশ বনাব বাংলাদেশ একাদশ। একটি দেশ যখন স্বাধীনতা অর্জনের

জন্য হাজারে হাজারে জীবন বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে। সেই দেশের স্বীকৃতি পৃথিবীর কোন দেশ দেয়নি সেই সময়ে ভারতীয় একাদশের সাথে বাংলাদেশ একাদশের ফুটবল টুর্নামেন্ট সত্যিই অভাবনীয় ঘটনা।

মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ অর্থাৎ বিহার, উড়িস্যা ও বাংলা ভারতবর্ষের বাইরে। এর মধ্যে বাঙালিরা বেশী আলাদা। মিশ্র জাতি হিসেবে ধরা হয় বাঙালিকে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারণে অভিনব নাটকীয়তা ঘটেছিল। ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের দিনে নদীয়া, মালদা ও মুর্শিবাদে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজেস্ট্রেটগণ পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অপরদিকে যশোর ও খুলনা ভারতের মধ্যে ছিল। কারণ সীমানা যিনি নির্ধারণ করবেন তিনি তখনো ভারতে এস পৌঁছেননি। ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট বৃটিশ আইনজীবী সিরিল র‍্যাডক্লিফ এমনভাবে সরলরেখা টেনে দিয়েছিলেন যে, অনেক পরিবারের বসতবাড়ী ও বৈঠকখানা দুই দেশে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে র‍্যাডক্লিকের সীমানা বন্টনে মালদা ও মুর্শিদাবাদ ভারতে চলে যায় আর নদীয়া ও দিনাজপুর ভাগ হয়ে যায়। নদীয়া থেকে কুষ্টিয়া ও যশোর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায় এবং দিনাজপুর ভাগ হয়ে পশ্চিম দিনাজপুর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব দিনাজপুর ভারতের সাথে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে রূপ নেয়। এতে স্পষ্ট যে, বাঙালির পরিবার বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে অযৌক্তিক কারণে ভাগ হয়েছিল। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মানে বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষের মানুষের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হওয়ার শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মহল রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী, কলামিস্ট, সাংবাদিকসহ সকল শ্রেণী পেশার জনগণ সমর্থন দিয়েছেন। তবে কিছু ব্যতিক্রম ছিল। কয়েকটি জেলায় যুদ্ধকালীন সময়ে শরণার্থীদের প্রবেশ করতে দেয়নি। যা সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। এসবে পরেও সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা ছিল প্রশংসনীয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সাংবাদিকদের ক্ষরদার লেখনীর মাধ্যমে প্রাণপণ ভূমিকা ছিল দ্রুত স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জনযুদ্ধে ভারত সরকার যে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ কলামের (Fourth Estate) ঈন্ধন ছিল সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যম শুরুতেই বেশ তৎপর ছিল। বিশেষ করে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও বিভিন্ন সাময়িকীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আবেগ প্রবণ প্রতিবেদন সবার নজর কেড়েছে।

৩রা এপ্রিল ১৯৭১, সাপ্তাহিক কম্পাস পত্রিকায় বি. চৌধুরী 'শুধু আবেগের ফেনা নয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেন 'পূর্ববাংলার এই দারুণ বিপদে পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকা বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সমেত গোটা ওপার বাংলা-আবেগে ফেটে পড়েছে। এতে ওপার বাংলা প্রেরণা পাচ্ছে ও পাবে, কিন্তু এখনই এই আবেগকে সুসংগঠিত করে বাস্তব কাজে লাগাতে হবে এবং ওপারের জীবনমরণ সংগ্রামে ঠিক ঠিক যা প্রয়োজন, যথাযথ নির্ভুলভাবে জোগাবার দায়িত্ব পশ্চিমবাংলাকে নিতে হবে ---' ।

১৯৭১ সালের ১ মে তারিখে আনন্দবাজার প্রবোধকুমার স্যানাল এর 'বাঙালাদেশ মানছারা মানবতার সঙ্গে পশুশক্তির লড়াই' সন্তোষকুমার ঘোষ এর 'সাত কোটি বাঙালীওে' (১৩ এপ্রিল '৭১ আনন্দবাজার) রমাপ্রদ চৌধুরীর

'মুজিবরের বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর মুখোশ খুলে দিয়েছে' (৪ এপ্রিল, '৭১, আনন্দবাজার)। এসব উপসম্পাদকীয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। যুদ্ধের অগ্রগতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকগদের নিকট দ্বিধা থাকলে কিংবা সাহসের অভাব বোধ হলে কলম ধরতে তাঁরা মোটেও কার্পন্য করেনি। ১৯৭১ সালের ৮ মে তারিখে সাপ্তাহিক কম্পাস পত্রিকায় ভারত সরকারকে খোঁচা দিয়ে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বিলম্ব হওয়াতে প্রতিবেদন করেছিল।

'ভারত সরকার নাকি তলে তলে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন আর কোন রাষ্ট্র আছে কিনা পৃথিবীতে, বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। কেউ নেই জেনে, ভারত সরকার নিজেও স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছেনা। এই অনীহা বা দ্বিধার পিছনে যুক্তি কী? শোনা যায়, মুক্তি নাকি এ রকম। প্রথমত একাই যদি ভারত স্বীকৃতি দেয়, আর কেউ না দেয়, তবে পাকিস্তানি সরকার প্রচারে সুবিধা পাবে এই বলে "দেখলে, আগাগোড়া ব্যাপারটা ভারতেরই, ভারতই উস্কানি দিয়ে পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের বিদ্রোহী করেছে"।[২৫]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমে যে অভাবনীয় ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল শুধু তাই নয়। এই রাজ্যে আগত শরণার্থীরা ভারত সরকারের নির্দেশে অন্য প্রদেশে যাওয়ার জন্য বলা হলেও অনেকে যেতে চায়নি। ভাষার কারণে এই অঞ্চলের মানুষের সাথে যে আত্মিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল তা অন্য এলাকায় সম্ভব নয়। এছাড়া কলকাতাসহ আশেপাশের সমাজসেবক, সাংস্কৃতিক কর্মী সর্বপরি সাধারণ জনতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অকুণ্ঠ সমর্থ দিয়েছিল। বাংলাদেশকে ভারতের সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সোচ্চার আন্দোলন চালিয়ে ভারত সরকারকে চাপে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৭০ সালের ১৮ এপ্রিল রাজভবনের পূর্ব দিকে কয়েকশত যুবক মিছিল করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবী জানায়। একইদিনে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানীয়ে পাক সৈন্যের অত্যাচারের নিন্দা জানায়।

তথ্যসূত্র :

১. জয়া চ্যাটার্জী, ভারত ভাগ হল, ঢাকা ২০০৩, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা-২৫

২. ইন্ডিয়ার এ্যানুয়েল রেজিস্ট্রার, এস এন মিত্র (সম্পাদিত), জুলাই-ডিসেম্বও ১৯৩২, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩৬

৩. সেন্সর অব ইন্ডিয়া, ১৯৩১, বেঙ্গল এ্যান্ড সিকিম, খন্ড-৫, অংশ-১; এ. ই. পোর্টারের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৮১-৩৮৮

৪. জয়া চ্যাটার্জী, ভারত ভাগ হল, ঢাকা ২০০৩, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা-৩১

৫. হিন্দু নেতৃবৃন্দের মেনিফেস্টো, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভা, ১৯৩২, জিবিএসবি ফাইল নং ৬২১৮/৩১;

৬. ঢাকার দাঙ্গা, রক্ষণশীল মুসলিম পত্রিকা 'শরীয়তে ইসলাম'-এর সম্পাদকীয়, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা-২, ফাল্গুন, ১৩৩৬ বাঙলা সাল। উদ্বৃত মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, বেঙ্গলি মুসলিম পাবলিক ওপিনিয়ন এ্যান্ড রিফ্লেক্টেড ইন দি বেঙ্গলি প্রেস; ১৯০১-১৯৩০, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৯৯-১০০

৭. ইন্ডিয়ান রাউন্ড টেবল কনফারেন্স (সেকেন্ড সেশন), প্রসিডিংস অব দি ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি এ্যান্ড দি মাইনরিটিজ কমিটি, ক্যালকাটা, খন্ড ৩, পৃ. ১৩৮৫। এছাড়া উদ্ধৃতি আছে রবিন্দর কুমার, গান্ধী, আম্বেদকার এ্যান্ড দি পুনা প্যাক্ট, পৃ. ১৬

৮. বি. আর. আম্বেদকার, গান্ধী এ্যান্ড গান্ধীইজম, জলন্ধর, ১৯৭০, পৃ. ৫৭-৫৮

৯. সেলাস অব ইন্ডিয়া, খন্ড ৫, পৃ. ২৮৯

১০. প্রাগুক্ত, দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯৪-৫০১

১১. সেলাস অব ইন্ডিয়া, খন্ড ৫, পৃ. ৪৯৯

১২. জয়া চ্যাটার্জী, ভারত ভাগ হল, ঢাকা ২০০৩, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা-৩৯

১৩. মধ্যবর্তী শ্রেণীর নাম দেওয়া হয় নবশক- প্রথমে এর সংখ্যা ছিল নয়। কোনরকম আনুষ্ঠানিক পবিত্রকরণ ছাড়াই উচ্চ শ্রেণীর লোক তাদের কাছ থেকে পানি পান করতে পারে।

১৪. এস. কে. গুপ্ত, দি সিডিন্ড কাস্টস ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ৯৯।

১৫. 'অপিনিয়নস অন দি আনটাচেবিলিটি এ্যাবোলিশন বিল', নং ১, প্রাগুক্ত।

১৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হাননান,

১৭. পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডি.সি. Pakistan Affairs ১৫ জানুয়ারি ১৯৭১। ভারত সরকার, পররাষ্ট্র দফতর: Bangladesh Documents, প্রথম খন্ড, নয়াদিল্লী, পৃ ১৩০।

১৮. পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডি.সি. Pakistan Affairs ১৫ জানুয়ারি ১৯৭১। ভারত সরকার, পররাষ্ট্র দফতর: Bangladesh Documents, প্রথম খন্ড, নয়াদিল্লী, পৃ ১৩১।

১৯. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশঃ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০০

২০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হাননান, পৃষ্ঠা-১৮৮

২১. দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ মার্চ, ১৯৭০

২২. স্বাধীনতার দলিল, তথ্য মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৬৬-৬৬৭

২৩. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ড. মোহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, প্রধান সম্পাদক, ডিএফপি, ঢাকা, ১ জানুয়ারি ২০১২

২৪. পৃষ্ঠা ১১৯-১২০ বাঙলা ও বাঙলার ইতিহাস ৪র্থ খন্ড প্রথম পর্ব) এবং ৪থ খন্ড/তৃতীয় পর্ব পৃ-৬৫

২৫. **মুনতাসীর মামুন, গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, অনন্যা, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৬] ৩ এপ্রিল, ১৯৭১**